একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক অনলাইন পিয়ার-রিভিউড গবেষণা পত্রিকা (রেফারিড জার্নাল, ত্রৈমাসিক)

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Gamhardunri: An Analysis of Forest-Centric Consciousness in Buddhadeb Guha's Literature

গামহার ডুংরী: বুদ্ধদেব গুহর অরণ্য-কেন্দ্রিক চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ

Name of the Author: Dr. Sk Parvej Hossein

Affiliation: Assistant Professor, Department of Bengali
Gourav Guin Memorial College, West Bengal, India

Abstract: The name of Buddhadeb Guha is frequently mentioned among other Bengali novelists recognized for their forest-centric narrative. He is another foregrounding author alongside Bibhutibhushan Bandopadhyay and Tarashankar Bandopadhyay known for their truthful and authentic representation of the verdurous terrestrial world. The specific focal point of Buddhadeb Guha literature is the forest and nature, its flora and fauna. Having been in close and essential contact with the nature from his youthful age, Guha developed a unique perspective on nature that distinguishes his creative faculty. This research paper explores Buddhadeb Guha's novel 'Gamhardungri' through eco-critical perspective, depicting young men and women committed to saving the forest and transforming barren land into flourishing, picturesque verdure. The narrative vividly portrays their contribution to the ecosphere and the gradational restoration of the terrain's natural state. The article also analyses the significance of the setting of the novel and meticulous descriptions of the Munda community's life. It discusses the intricate linkages between nature and the human world as illustrated in the story. The folk culture of the Mundas is depicted specifically, including customs of birth, death, marriage, and divorce, as well as their traditional love song also. The name of the catcalls in the Munda language, their distinct individualities, and the social status of women within the Munda society are examined. Eventually, the discussion emphasizes how Buddhadeb Guha successfully integrates the aboriginal tribal people with the terrain in the novel. Although the author himself represents the materialistic and utilitarian civilization, through the hands of original characters, he makes a compelling and effective efforts to portray the intrinsic coexistence of the natural and human world. This reflects his nature-sensitivity, responsible erudite mindset, emphasizing the authentic harmony between mortal society and nature.

Key Word: Buddhadeb Guha, Gamhardungri, Forest Conservation, Ecocriticism, Munda Tribe, Environmental Literature, Reforestation, Indigenous Folklore, Nature Culture Symbiosis, Bengali Fiction.

‘গামহারডুংরী’: বুদ্ধদেব গুহর অরণ্য-কেন্দ্রিক চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ

ড. সেখ পারভেজ হোসেন

বাংলা কথাসাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর অরণ্যকে তাঁর লেখনীর মুখ্য উপজীব্য করেছেন যিনি, তিনি বুদ্ধদেব গুহ। তাঁর ‘গামহারডুংরী’ উপন্যাসটি কেবল একটি কাহি নি নয়, বরং এটি নাগরিক মানুষের শিকড়ের সন্ধানে অরণ্যে প্রত্যাবর্তনের এক মনস্তাত্ত্বিক আখ্যান। গবেষকদের মতে, বুদ্ধদেব গুহর সাহিত্যে অরণ্য কোনো জড় পটভূমি নয়, বরং এক জীবন্ত চরিত্র। সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, “গুহর অরণ্য মূলত নাগরিক মধ্যবিত্তের মুক্তি ও যৌনতার এক অবাধ প্রান্তর”[১]।

বাংলা সাহিত্যে অরণ্য পটভূমিকায় উপন্যাস সৃষ্টির সংখ্যার নিরিখে প্রথম স্থান যে বুদ্ধদেব গুহ দখল করে নিয়েছেন, সে বিষয়ে সাহিত্য সমালোচকেরা সহমত হবেন। দেশ এবং বিদেশের বিভিন্ন অরণ্য তার উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে এসেছে। এই অরণ্যপ্রীতি তাঁর পারিবারিক সাহচার্যেই গড়ে ওঠে। বুদ্ধদেব প্রথম অরণ্যে যান বাবার হাত ধরেই। অরণ্যকেন্দ্রিক গল্পসংকলন ‘জঙ্গলমহল’-এর উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছেন–

> “আমার বাবাকে, যাঁর হাত ধরে প্রথমে বনে–পাহাড়ে গিয়েছিলাম, এবং যার
> উৎসাহ, আশীর্বাদ, অদম্য সাহস, রসবোধ এবং সুপুরুষ ব্যক্তিত্ব
> আমাকে সর্বক্ষণ অনুপ্রেরণা জোগায়।”[২]

বুদ্ধদেব গুহ বেশিরভাগ অরণ্যকেন্দ্রিক উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে নাগরিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত কোন মানুষ। তাঁর অরণ্যকেন্দ্রিক উপন্যাস বিভূতিভূষণ, সমরেশ বসু, মহাশ্বেতা দেবীদের থেকে আলাদা। তাঁর অরণ্যপ্রেমে এক আদিম যৌনচেতনা মিশে যায়। সমগ্র প্রকৃতি তাঁর কাছে ধরা দেয় নারী হিসেবে, শুধুমাত্র লিরিক্যাল বা কাব্যিক সৌন্দর্য্যে নয় – যৌন আবেদনসহ। ‘প্রতিটি গাছই এক একজন সুগন্ধী নারী’। লেখক জানাচ্ছেন –

“জঙ্গলের ভিতর যখনই অবসরে, আলস্যে একা-একা বসে থাকি, তখনই আমার সমস্ত সত্তা ধীরে ধীরে উত্তপ্ত ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আমাকে ঘিরে হাজার হাজার বিভিন্ন ও বিচিত্র ভঙ্গীতে দন্ডায়মান নগ্না রমণীদের উরু ও জঙ্ঘা আমার চোখ ভরে দুলতে থাকে। তার সঙ্গে পাখির ডাক, ফুলের গন্ধ, রোদের আমেজ সমস্ত মিশে আমাকে যেন বারে বারে কি এক অনায়াসলব্ধ সুগন্ধি স্বপ্নলোকে নিয়ে যায়। এই নির্জনে, এতজন সবুজ নগ্না নীরব রমনীর সান্নিধ্যে বারে বারে দারুণ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ি।”[৩]

এই নেশায় তার হাত থেকে একের পর এক সার্থক অরণ্য কেন্দ্রিক উপন্যাসের জন্ম দেয়।

প্রাচীনকাল থেকে অরণ্য নানা ভাবে মানুষের সেবা করে আসছে, বলা ভালো মানুষকে নানা বিপদ থেকে রক্ষা করে আসছে, অথচ নগরায়ন, বিশ্বায়নের প্রভাব মানুষকে এত বেশি মোহান্বিত করে তুলেছে যে মানুষ আজ অন্তর্জালে আবদ্ধ। প্রতিদিন সুখস্বাচ্ছন্দ, আরাম আয়েশ বাড়ানোর তাগিদে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন সিটি, স্মার্ট সিটি আর ধ্বংস হচ্ছে অরণ্য জঙ্গল। বড় বেশি স্বার্থপর আমরা। এই অসম্ভব স্বার্থলোভীদের

নানাভাবে আগত দিনের বিপদের কথা পরিবেশবিদদের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সময়ের সাহিত্যকরাও মনে করিয়ে দিয়েছেন। একবিংশ শতাব্দীর অগ্রণী কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ডাক দিয়েছিলেন - "অরণ্যে ফেরো", বুদ্ধদেব গুহ তার উপন্যাস 'গামহারডুংরী'তেও সেই একই ডাক দিলেন। শুধু প্রকরণ আলাদা, একজন কবিতায় তো অন্যজন উপন্যাসে। বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতিসান্নিধ্য তথা প্রকৃতিপ্রীতি বিভূতিভূষণ তারাশঙ্করের লেখায় এসেছে বারবার কিন্তু বুদ্ধদেব গুহর লেখায় তার প্রকাশ একটু অন্যভাবে। এই আলোচনায় আমরা দেখব 'গামহারডুংরী' কিভাবে একদল তরুণকে অরণ্য বাঁচানোর সংগ্রাম, দিনবদলের স্বপ্ন কিভাবে দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক, যে অরণ্য নগরায়নের প্রভাবে নষ্ট হবার জোগাড়, সেই অরণ্যের সন্তান হিসেবে মুন্ডাজনজাতির জীবন এবং পরিবেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, পরিবেশরক্ষায় তাদের প্রয়াস সবই আলোচনার মধ্যে উঠে আসবে।

"গামহারডুংরী" উপন্যাসের মূল বিষয় হল 'তমাল' একটি বড় টিলাকে কেন্দ্র করে, যে টিলার মাথাতে কয়েকটি প্রাচীন গামহার গাছ ছিল, সবুজায়নের স্বপ্নে মেতে উঠেছে – সঙ্গী করেছে পাখি, ঋষি, সুনয়নী, রেবতী এবং আরও কয়েকজন অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে। যাদের কেউ উদ্ভিদতত্ত্বের ছাত্রী, কেউবা বনবিলাসী। প্রত্যেকেই এই কলুষিত পৃথিবীকে সবুজায়নের মাধ্যমে প্রাণীত করতে চায়। কোন ফাঁকি নেই তাদের বিশ্বাসে। বুদ্ধদেব গুহ উপন্যাসের শুরুতেই দুঃখের সঙ্গে বলেছেন-

> "শহরের মানুষের কাছে গাছের ভূমিকা সম্ভবত এখনও স্পষ্ট নয়। গাছের ভূমিকা সম্বন্ধে ওরা হয়তো অবহিত হবেন এই সুন্দর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার পরে"[৪]

আসলে ঋদ্ধিরাতো 'গাছকে গাছ বলেই জেনে এসেছিল'। গাছও যে প্রাণী তাদেরও যে সুখদুঃখ বাঁচামরা আছে, তারাও যে ভালোবাসা এবং ভালোবাসার অভাব বুঝতে পারে তা ঋদ্ধির মত তথাকথিত উন্নত সংস্কৃতিবান, বিশ্বায়নে বিমোহিত যন্ত্রসভ্যতায় যন্ত্রে পরিণত নাগরিক মানুষজন জানে না অথবা জানতেও চায় না বোধ হয়। আগেই বলেছি 'গামহারডুংরী' একটি জায়গার নাম- যেখানে তমাল কয়েকজন তরুণতরুণীকে নিয়ে সবুজায়নের উদ্দেশ্যে কাজ করে চলেছে। ঐ অঞ্চলের মানুষজনও তমালকে শ্রদ্ধা করে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় যেমন তাঁর 'অঙ্গুরি তোর হিরণ্যজল' কাব্যগ্রন্থের 'আমি দেখি' কবিতায় লিখেছেন-

> "গাছ তুলে আনো, বাগানে বসাও।
> আমার দরকার শুধু গাছ দেখা
> গাছ দেখে যাওয়া"।

গাছ শুধু কবির দরকার তা নয়, মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে গেলে দরকার গাছ লাগানো। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসে এসেছে জমসেদপুরের কমলদা, বান্দোয়ানের 'ভালোপাহাড়ের' কথা। এঁরা লোকচক্ষুর আড়ালে নিজের নিজের বিশ্বাসকে রুক্ষ, কঠিন, লালমাটির বহিরাবরণকে বিদ্ধ করে গাছের মত প্রোথিত করে তাতে নিয়ত জল সিঞ্চন করছে। রাতারাতি প্রচারের আলোয় আসার জন্য এঁরা সবুজায়নে নিজেদের নিয়োজিত করেনি, 'দেশের এই বিশেষ সংকটের সময়ে দেশকে বাঁচানোর প্রচারহীন সংকল্প নিয়ে নিজেদের ধন-প্রাণ এমন করে নিঃশেষে নিবেদন করেছেন'।

পশ্চিমবঙ্গের বনবিভাগের একটি জনপ্রিয় শ্লোগানের পোষ্টার গামহারডুংরীর অফিসে টাঙিয়ে দিয়েছিল ঋদ্ধি-

"গাছ বাঁচলে বাঁচবে তুমি
বন বাঁচলে সুখ
সবুজে সবুজ হোক বাংলার মুখ।"[৫]

ঋদ্ধি, রুরু, রেবতী, পাখি ও বুধাই নতুন নতুন গাছের চারা পুঁতে টাঁড়ে, নিয়মিত তাদের পরিচর্যা করে, জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করে বাংলার মুখ সবুজ করতে চায় তারা। গামহারডুংরীতে সামাজিক বনসৃজনের অংশ হিসেবে আলাদা, যা বুধাই ঋদ্ধিরা আসার আগেই লাগানো হয়েছিল। এখন নতুন টাঁড়ে গাছ লাগানোর কাজ চলছে। আশেপাশের মুণ্ডারিদের গ্রামে অনেক চারা দিয়েছে তমালরা, তারাও লাগিয়েছে সেসব গাছ। আম, জাম, কাঠাল, পেয়ারাসহ আরও অনেক প্রয়োজনীয় গাছ – ফলবাহী গাছ। সেইসব ফল পাখিরাও খাবে, মানুষও খাবে। টাঁড়ে নানাধরনের গাছ লাগিয়েছে তারা, যেমন শ্বেতশিমুল, তুঁত, সজিনা, কুল, কয়েৎবেল, পেয়ারা, রুদ্রাক্ষ, ফলসা, অশ্বত্থ, চালতা, খয়ের, করঞ্জা, তমাল, রিঠা, নাগেশ্বর, কাজু, পুত্রান্দিবা, আশফল, আতা, মজিডুমুর, বরুন, পাইন, বেল, নারকেল, সেগুন, ছাতিম, হিজল, মাদার, আমলকী, বহেড়া, হরিতকি, শালপ্রভৃতি। পাঁচ-সাতবছর আগে তমালদের লাগানো গাছগুলো এখন দেখলে নবীন জঙ্গল বলে মনে হয়। উপন্যাসের নামকরণ যে অঞ্চলটাকে নিয়ে – সেই নামকরণ করেছিল স্থানীয় মানুষজন, ওইখানে অনেকগুলো পুরনো গামহার গাছ ছিল বলে। সজল চট্টোপাধ্যায় বুদ্ধদেব গুহর ছোটঙ্গপুর অঞ্চলের প্রতি টান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন- "গুহর অরণ্য বিভূতিভূষণের মত নয়, বরং তা রক্তমাংসের জৈবিক টানে ঋদ্ধ। ছোটনাগপুরের লালমাটি এখানে চরিত্রের টানে প্রবাহিত হয়।"[৬] আসলে বুদ্ধদেব গুহর অরণ্য-পাঠ অনেক বেশি বাস্তববাদী ও ইকো-ক্রিটিক্যাল।

কেন টাঁড়গুলিকে বেছে নিল তমাল বনসৃজন -এর উপযুক্ত স্থান রূপে। কারণ ওই পুরো অঞ্চলটাই ন্যাড়া হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে অনেক বছরের বৃক্ষছেদনের ফলে , নানা ঠিকাদারীরা ক্লিয়ার ফিলিং করেছিল , আইনশৃঙ্খলাহীন স্থানীয় মানুষরাও সেই বনবিনাশ -এ কোন না কোন ভাবে সামিল হয়েছিল । এমনকি এই মুন্ডাদের বসতবাড়িতে যেকটা গাছ ছিল তাও তাদের মেয়েদের বিয়েতে কেটে ফেলা হয়েছিল বিক্রির জন্য । একসময় ওই সমস্ত টাঁড় ও ডুংরীতে ঘন জঙ্গল ছিল, খরগোশ, ময়ূর, তিতির, বটের, ছোট কোটরা হরিণ এবং শুয়োরের আড্ডা ছিল সেসব মরুভূমি হয়ে গিয়েছিল । তমাল 'গতবছর' থেকে ফতোয়া জারি করেছে যে, যে একটাও গাছ বা চারা কাটবে, তার হাত কেটে দেব, প্রয়োজনে প্রাণ নিতেও পিছপা হয়নি তমাল। সর্দার যোগিন্দর সিংহের যে বিরোধ তার নিরসন হয়েছিল যোগেন্দ্র সিং এবং তার ভাড়া করা গুন্ডাদের প্রাণের বিনিময়ে। তমাল মুন্ডাদের ভালো করে বুঝিয়ে দেয় গাছ কাটাও মানুষ মারার মত অপরাধ, এরেস্ট হয় তমাল, তারপর ঘটে যায় অন্যরকম ঘটনা । গ্রামের মানুষ থানা ঘেরাও করে, পুলিশ গুলি চালায়, প্রায় দশ জন গ্রামবাসী মারা যায়, রাতেই থানার উপর চড়াও হয় এন .সি.সি.-র ছেলেরা। দারোগা এবং পাঁচ জন পুলিশকে গুলি করে, থানা লুট করে থানা জ্বালিয়ে দেয়। বিরসা মুন্ডা ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই করেছিল স্বাধীনতার জন্য

আর বিরসার উত্তরসূরীরা তমালের নেতৃত্বে লড়াই করেছিল মুনাফাবাজ ঠিকাদার আর অসৎ পুলিশদের সঙ্গে – এও প্রায় আর এক 'উলগুলান', এটা সবুজের জন্য উলগুলান।

গাছ না বাঁচলে, বন না বাঁচলে তারা নিজেরাও বাঁচবে না এ কথাটা প্রতি গ্রামে গিয়ে রাতের অন্ধকারে মিটিং করে, প্রতি হাটে হাটে বলে বেড়িয়েছে তারা । সবুজের মন্ত্র দিয়ে এই পথভ্রষ্ট মানুষদের ঠিক পথে ফিরিয়েছিল তমাল এবং তার অনুসারীরা । তমাল বেকসুর খালাস হয়ে গাম হারডুংরীতেই ডেরা বানায় এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে, ছাড়া অঞ্চলকেই সে সবুজ করে দেবে । তমালদের হাত দিয়ে সবুজায়নের ডাক দিলেন বুদ্ধদেব গুহ।

অরণ্য শুধুমাত্র গাছ-গাছালি নিয়েই নয়, অরণ্যের শোভা বর্ধন করে পাহাড় নদীও। অরণ্যের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া স্রোতস্বিনী কিংবা ধীর গতিসম্পন্ন নদী প্রকৃতিকে করে তোলে মোহনীয় । গামহার ডুংরীর পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে তাজনা নদী, মানুষের 'খম্বুরি-জঙ্গুরি' এতটা বেড়ে গেছে যে তারা অরণ্য ধ্বংস করেই থামেনি, প্রতিদিন নিঃস্ব করে চলেছে তাজনাকেও । বিশাল কাকার কথা য় উঠে এসেছে সে প্রসঙ্গই - "এক সময় সে তার পাথর আর বালির জন্য খুবই বিখ্যাত ছিল । বছরের পর বছর ঠিকাদারেরা নদীর বুক খুঁড়ে বালি নিয়ে গেছে ট্রাকে ভরাট করে শহরাঞ্চলের মানুষের পাকা বাড়ি বানানোর জন্য। গরমের দিনে নদীর বুকময় ছড়ানো অজস্র পাথরগুলোকে ডিনামাইট দিয়ে ভেঙে টুকরো করে ট্রাকে করে নিয়ে গেছে। "[৭] তবে বর্ষাতেই নদী ভরে যায় আবার । নদী যেন নিরুচ্চারে গান গায় – "আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব/ ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব।"[৮] রুরুর কথায় উঠে এসেছে ইকোলজির সর্বনাশের প্রসঙ্গ- "রুরু ,...। ইকোলজির এমন সর্বনাশ তো আগে হয়নি কখনো । হিমবাহ বলে যাচ্ছে, অমরনাথের শিবলিঙ্গ গলে যাচ্ছে, চারিদিকে বন্যা, ভূমিকম্প এ সবই আমাদের কৃতকর্মের ফল ।"[৯] বিশাল কাকার কথায় জানা যায় খুঁটি থেকে যে কাঁচা পথটা সাইকো, তামার হয়ে টাটা এবং রাঁচি থেকে আসা হাইওয়ের উপরে সুবর্ণরেখার পাশের বুন্ডুতে পৌঁছে গেছে, সে পথে এক সময়ে এমন জঙ্গল ছিল যে মুন্ডারা দল বেঁধে হাতের টাঙ্গি , তীর-ধনুক, বল্লম নিয়ে সে পথে চলাচল করতো। সেই রকম জঙ্গল ছিল টোবোঘাটে - চক্রধরপুর পর্যন্ত। বন্দরগাঁও থেকে বাঁদিকে উড়িষ্যার গয়েলকেরা সবই জঙ্গল ছিল। আজ সেসব প্রায়ই ফাঁকা। মানুষের অর্থ পিপাসা গ্রাস করেছে তাদের। একই কথা উঠে এসেছে সিরকা মুন্ডার মুখে। এই বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে লেখকের মনের কথা সিরকার মনের কথা হয়ে ফুটে ওঠে – "তবে এটা ঠিক যে, পু রো পৃথিবীকে তারা একেবারে ন্যাংটো করে ছেড়ে দেবে এই পণ নিয়েছে।"[১০]

অরণ্য মানেই অরণ্যের সন্তানদের কথা অবশ্যম্ভাবী ভাবে চলে আসে। বুদ্ধদেব গুহ উপন্যাসে শুধু অরণ্য প্রকৃতির কথাই তুলে ধরেন নি, তাঁর উপন্যাসে এসেছে অরণ্যের আদিবাসীদের জীবনচিত্র এক নিষ্ঠাবান গবেষকের দৃষ্টি থেকে। এই উপন্যাসে মুণ্ডা জনজাতির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানান লোকসংস্কার, সঙ্গীত, প্রথার কথা উঠে এসেছে নিখুঁতভাবে।

মুন্ডা জনজাতির মধ্যে শিশুর জন্মের পর 'চট্টি' করতে হয়। মুন্ডা শিশু জন্মালেই মুণ্ডা হতে পারে না, সিরকা'র কথায়

"শিশু জন্মানো মাত্রই মুণ্ডা সমাজের একজন কিন্তু সে হয়ে ওঠে না। জন্মের ন'দিন পরে, চন্দ্রমাসের হিসেবে চট্টি উৎসব করি আমরা। যে-মাদুরে শিশু ভূমিষ্ট হয়েছিল তাও পুড়িয়ে দিই। সকলে নখ কাটি। চাট্টি উৎসবে শুধু শিশুকেই যে পবিত্র করে নেওয়া হয় তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে তার মাকেও পবিত্র করা হয়। দুজনকেই মুণ্ডা সমাজ গ্রহণ করে। মাকে নতুন করে; শিশুকে প্রথম বার।"[১১]

মৃত্যুর পর মুন্ডারা মৃতদেহ কবর দেয়। দক্ষিণে মাথা আর উত্তরে পা। তারা বিশ্বাস করে মানুষ মারা গেলেও তাঁর আত্মা থেকে যায়, 'জি' থেকে যায়, 'রোয়া' থেকে যায়। উপন্যাসে এসেছে তাদের মৃত্যুকেন্দ্রিক প্রথা ও বিশ্বাস প্রসঙ্গ-

"মৃতকে 'সাসানডিহিতে শুইয়ে রেখে তার ছায়া নিয়ে আসি আমরা। তারই বাড়ির পাশে ছোট্ট চালাঘর বানিয়ে তাকে আমরা থাকতে দিই। মানে, আর ছায়াকে। তারপর সেই চালাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাকে তার নাম ধরে তিনবার ডেকে বলি, "পালাও! পালাও! তোমার ঘরে আগুন লেগেছে।"[১২]

তারা 'রোয়া'রও শরীর আছে এমনভাবে দেখে, তারা তাকে থাকার জায়গা দেয়, খাবার জল দেয়। একসময় সেটা বোঙ্গা হয়ে যায়, "ওরা-বোঙ্গা"।

লোক সমাজে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সমাজচিত্র ফুটে ওঠে নিপুণ ভাবে। মুণ্ডাদের সমাজে প্রচলিত গানের মধ্য দিয়ে প্রেমবিবাহের মত বিষয়গুলিকে নিপুণভাবে উঠে আসতে দেখি। কোন ছেলে কোন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে মেয়েটি গান গেয়ে বলে –

"আয়ো ঘরে বাবা ঘরে।
রিঙ্গিচিঙ্গি – চিকন পিণ্ডা
ছুটত নই আওয়ে
বাপকা প্রেমসে, ভাইকা প্রেমসে ছুটত নই আওয়ে।"[১৩]

অর্থাৎ মেয়েটির বাবামায়ের ঘর খুবই সুন্দর, তাই বাবার স্নেহ, ভাইয়ের ভালোবাসা ছেড়ে সে কিভাবে যেতে পারে। আবার মেয়ের বিয়ে ঠিক হলে তাঁর প্রেমিক গেয়ে শোনায়–

"সাসানউলি সাসানসুতাম
কাটা দোরেমরাঙ্গানজানা"[১৪] (গুহ, ৪৪)

এটা প্রেমিকের প্রেমিকার প্রতি খুনসুটি করে বলা। মুণ্ডা সমাজে নারীদের স্বাধীনতা সাধারণ বাঙ্গালি সমাজের মেয়েদের থেকে অনেক বেশি। মুন্ডা সমাজের মেয়েরা যদি মনে করে পুরুষটি তাঁর মনের মত হয়নি তাহলে সহজেই বিবাহ বিচ্ছেদ 'সাকামচারি' করে নিতে পারে। পঞ্চায়েত সদস্যরা দুজনের কথা শুনে সহজেই বুঝে যান এবং তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। মুণ্ডারা বোঝে দাম্পত্যে শারীরিক সম্পর্কের গুরুত্ব, তাই তারা এ বিষয়ে কোন লোকলজ্জার মত বিষয়কে প্রাধান্য দেয় না।

লোকবিশ্বাসে ভূতের প্রসঙ্গও এসেছে উপন্যাসে। সবচেয়ে বড় ভূত 'খুটকাট্টি', 'ইকরি-বোঙ্গা', 'বুড়ুবোঙ্গা', মুয়াভূতের অতীত অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এইসব ভূতের চোখদুটো আগুনের মত জ্বলে,

সবচেয়ে বেশি জ্বলে চুরিণের। তার লম্বাচুল, হাত পায়ের নখ বড়বড়। জলের ভূতও আছে 'নাগেবোঙ্গা' নামে। এইসব ভূতেদের খৈনি, বকরি বা মুরগির মত নৈবেদ্য নিবেদন করা তারা প্রার্থনা করত।

তাদের সাজপোশাক সামান্য হলেও হাটের দিন মেয়েরা সাজগোজ করতে পছন্দ করে। পরনে শাড়ি, মাথায় করৌঞ্চ বা নিমের তেল, চুলে গোঁজা থাকে পলাশ, কুর্চি, হুন্দি, কুসুম বা হুড়ুন্দা ফুল। পায়ে মল, নাকে নোলক, পায়ের আঙ্গুলে চুটকি পরতে দেখা যায়।

মুন্ডারা পাখিদের ভিন্ন নামে ডাকে। আলোচ্য উপন্যাসে লেখক তেমনই অনেক পাখির নাম আমাদের জানিয়ে দেন। মায়না (ময়না), কেরকেটা (ছাতারে), ঢেঁচুয়া (ফিঙ্গে), রিচ্চি (বাজ), তোঁইয়াশা (বড়কিধনেশ), কাওয়া অর্থাৎ দাঁড়কাক মুণ্ডাদের সবচেয়ে সম্মানিত পাখি।

বাংলা সাহিত্যে অরণ্য, অরণ্যকেন্দ্রিক আদিবাসী সমাজচিত্র এত নিপুণভাবে বুদ্ধদেব গুহর মত কেউ তুলে ধরতে সক্ষম হন নি। ইকোক্রিটিসিজমের দৃষ্টি থেকে দেখলে বুদ্ধদেব গুহর 'গামহারডুংরী' উপন্যাসের পরতে পরতে পরিবেশ রক্ষার আহ্বান শোনা যায়। 'চাটন মুণ্ডা'র মত প্রথাগত শিক্ষাদীক্ষাহীন মানুষটিকে পরিবেশ রক্ষায় নিজেকে নিঃস্বার্থভাবে নিয়োজিত করতে দেখি। তার জীবন শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রকৃতিতেই মিশে গেছে। তারই উত্তরাধিকার হিসেবে গামহার ডুংরিতে তমাল এসেছে। সে তার সঙ্গীদের নিয়ে মেতে উঠেছে বনসৃজনযজ্ঞে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে বর্তমান বিশ্ব তোলপাড় । দেশে দেশে পরিবেশবাদী বৈঠক , বিভিন্ন কমিটি গঠন, প্রতিনিয়ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া, এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের চুক্তি - আনুষ্ঠানিকতায় ভরা নানা কথা ফুলঝুরি আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করি। কাজ কতখানি হচ্ছে তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায় । কিছু মানুষ লোক দেখানো কর্মযজ্ঞ আয়োজন করে সুনাম অর্জনে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকে । 'গামহারডুংরি' উপন্যাসটি বাংলাসাহিত্যে প্রকৃতির এক বহুমাত্রিক উপস্থাপনা। সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে লিখেছেন:

"আধুনিক উপন্যাসে প্রকৃতি আর নিষ্ক্রিয় নয়, তা মানুষের চেতনার সমান্তরালে এক স্বতন্ত্র জীবনবোধ তৈরি করে।"[১৫]

আমাদের আলোচ্য উপন্যাসে বুদ্ধদেব গুহ নীরবে দেশ তথা পৃথিবীকে সবুজ করতে চাওয়া মানুষদের কথা ও তাদের কার্যকলাপ তুলে ধরে যেমন পরিবেশসচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন তেমনি মানুষকে অরণ্য ধ্বংস নয়, অরণ্যের কোলে বেড়ে ওঠা মানুষদের সংস্কৃতি ধ্বংস নয়, সংরক্ষণের ডাক দিলেন। নতুন করে গড়ে তোলার ডাক দিলেন।

তথ্যসূত্র

১। বন্দ্যোপাধ্যায় পার্থপ্রতিম, বাংলা উপন্যাসে অরণ্য সংঘাত, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৪৫।
২। গুহ বুদ্ধদেব, জঙ্গল সম্ভার, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮ উৎসর্গপত্র।
৩। গুহ বুদ্ধদেব, জঙ্গল সম্ভার, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮, উৎসর্গপত্র।
৪। গুহ বুদ্ধদেব, গামহারডুংরী, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৯।

৫। গুহ বুদ্ধদেব, গামহারডুংরী, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮, কলকাতা -৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৩৪।
৬। চট্টোপাধ্যায় সজল, বুদ্ধদেব গুহর ছোটনাগপুর: একটি পরিবেশবাদী পাঠ, সাহিত্য পত্রিকা, সংখ্যা ৪, ২০১৮, পৃষ্ঠা ১২-১৫ ।
৭। গুহ বুদ্ধদেব, গামহারডুংরী, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৬৪।
৮। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গীতিমাল্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৪৬, পৃষ্ঠা ৩৭।
৯। গুহ বুদ্ধদেব, গামহারডুংরী, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৬৪।
১০। তদেব, পৃষ্ঠা৮৯।
১১। তদেব, পৃষ্ঠা১১৫।
১২। তদেব, পৃষ্ঠা১১৪।
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা৪৩।
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৪৪।
১৫। চক্রবর্তী সুমিতা, কথাসাহিত্যের নানা মাত্রা, পুস্তক বিপণী, ২০০২, পৃষ্ঠা১১২